একটি জাতিকে হত্যা: স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা

আবদুর রউফ চৌধুরী

At the All India Muslim League
Working Committee
Lahore session, 23 March 1940

১৪ই আগস্ট ১৯৪৭ সালের মধ্যরাতে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান ঘটে। রক্তপাত, পারস্পরিক ঘৃণা ও ধর্মীয় ছলনাময়ী দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও ভারত গঠিত হয় ১৯৪৭ সালে। বাংলাকে বিভক্ত করে, পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে, পাকিস্তান জন্ম নেয়। ভারতবর্ষের বিভাগের ফলে অগণিত মানুষের বাসভূমি বদলে যায়। এক কোটি মানুষ গৃহহারা, পঞ্চশ লক্ষ মানুষ নিহিত, বাইশ হাজার নারী ধর্ষিত, দু-লক্ষ কুড়ি হাজার মানুষ নিখোঁজ হয়। এক রাষ্ট্র ও এক পতাকার প্রতি স্বার্বভৌমত্বের আনুগত্য প্রকাশে পূর্ব-বঙ্গ প্রথম দিন থেকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসে। পূর্ব-বঙ্গ জনসংখ্যার দিক থেকে পশ্চিমাঞ্চলের চেয়ে বেশি হলেও রক্তঝরা অতীত জীবন পিছনে ফেলে বাঙালি স্বপ্ন দেখতে থাকে এক স্বনির্ভর রাষ্ট্রের, যেখানে কৃষি ও কুটিরশিল্পের পুনর্বিকাশ ঘটবে। স্বপ্ন দেখতে থাকে গণতন্ত্রচালিত একটি দেশের, সেখানে রাষ্ট্র শিল্পায়নে অগ্রণী ভূমিকা নেবে। দুঃখ, কষ্ট ও ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার মধ্যেও বাঙালি নতুন জীবন শুরু করে। সোহরাওয়ার্দি হবেন পূর্ব-বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী– এ আশা করা স্বাভাবিক পূর্ব-বঙ্গবাসীর; কিন্তু বাস্তবে লিয়াকত আলী খানের যোগসাজসে তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে পারলেন না, হলেন নাজিমুদ্দিন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুর্দশার জন্য এ সিদ্ধান্ত চরম দায়ী; এর সঙ্গে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভৌগলিক, সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক, প্রাকৃতিক ব্যবধানও। পাকিস্তানের অর্থনীতির উপর পূর্ব-বঙ্গের প্রভাব বিস্তর। পাকিস্তানের মোট বাজেটের এবং বৈদেশিক মুদ্রার আয়ের অংশ হিসাবে পূর্ব-বঙ্গের শতকরা ৭৫ভাগ। পাটশিল্পের ক্ষেত্রে পৃথিবীর মধ্যে পাকিস্তানের অর্থাৎ পূর্ব-বঙ্গের স্থান সবার উপর। পূর্ব-বঙ্গেই সুতীবস্ত্র প্রচুর পরিমানে উৎপন্ন হয়। গুণমান, বৈচিত্র ও মূল্যের বিচারে পূর্ব-বঙ্গের বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো তুলনাই নেই। অতএব পাকিস্তানের পক্ষে পূর্ব-বঙ্গের ওপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠাই হয়ে দাঁড়ায় একান্ত বাঞ্ছনীয়। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের শোষণপোষণ বন্ধ হওয়ার ফলে জনগণের আর্থিক অবস্থা বলিষ্ঠ হওয়া কথা ছিল; কিন্তু বাস্তবে এর ফল হয় উল্টো। যে পশ্চিমাংশ মরূভূমি আর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিল্পক্ষেত্রে পশ্চাদপদ; সে পাকিস্তান ক্রমাগত ফুলেফেঁপে, ঐশ্বয্য আর বৈভবে ভরে উঠছে। এর পাশাপাশি অগ্রসর পূর্ব-বঙ্গ ক্রমাগত অর্থনৈতিক দিক থেকে পঙ্গু এবং অবহেলিত, বঞ্চিত– সহজ ভাষায় শোষিত হয়ে আসছে। এ অর্থনৈতিক শীর্ণতা বঞ্চনার বিরূপ প্রতিক্রিয়া জনমনে অসন্তোষ এবং

নৈরাশ্য সৃষ্টি করে। এ আরও অসহায়ক করে তুলে পশ্চিমা প্রভুত্বে পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছাকৃত এবং ষড়যন্ত্রমূলক কতগুলো রাজনৈতিক কার্যক্রম; যেমন ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের পরিষদে যখন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবী তুলেন তখনই শুরু হয় উর্দ্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্র, বাংলার সংস্কৃতিকে গলা টিপে মারার দুরভিসন্ধি, শিল্পোন্নয়নে পূর্ব-বঙ্গের প্রতি বিমাতাসুলভ মনোভাব এবং কেন্দ্রীয় চাকুরীর ক্ষেত্রে পূর্ব-বঙ্গের অধিবাসীদের উপেক্ষা। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর এই স্বার্থবাদী প্রবনতা পূর্ব-বঙ্গের জনগণের চোখ খুলে দেয়, তারা বুঝতে পারে, পশ্চিমের সংহতি ও ধর্মীয় বন্ধনের গালভরা বুলির আজ কী রূপ! বিরূপ হয়ে উঠে বাংলার মানুষের মন শক্তশালী কেন্দ্রীয় শাসকের বিরুদ্ধে। শুরু হয় ১৯৪৮-১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪-র নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি, ১৯৬২-র ছাত্র আন্দোলন, ১৯৬৫-র ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, ১৯৬৬-র ছয়দফা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান এবং ১৯৭০-এর নির্বাচন। এসব আন্দোলনই পূর্ব-বঙ্গের স্বায়ত্বশাসনের দাবী স্বাধীনতার ভিত্ত নিমার্ণ করে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় চরিত্র ফেডারেল ধরণের, অতএব, ফেডারেশনের অঙ্গরাজ্যগুলো দেশের সামগ্রীক অখণ্ডতা রক্ষা করে নিজ নিজ অঞ্চলে নিজের প্রয়োজন মোতাবেক বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকারী হবে– এই তো স্বাভাবিক; কেননা আঞ্চলিক সমস্যার মোকাবেলায় সেখানকার জনগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সরকারই যোগ্যতম; এ সুবিধা বা ক্ষমতাই হচ্ছে স্বায়ত্বশাসন।

"While approving and endorsing the action taken by the Council and the Working Committee of the All India Muslim League, as indicated in their resolutions dated the 27th of August, 17th & 18th of September and 22nd of October, 1939, and the 3rd of February, 1940 on the constitutional issue, this session of the All India Muslim League emphatically reiterates that the scheme of federation embodied in the Government of India Act 1935 is totally unsuited to, and unworkable in the peculiar conditions of this country and is altogether unacceptable to Muslim India.

"It further records its emphatic view that while the declaration dated the 18th of October, 1939 made by the Viceroy on behalf of His Majesty's Government is reassuring in so far as it declares that the policy and plan on which the Government of India Act, 1935, is based will be reconsidered in consultation with various parties, interests and communities in India, Muslims in India will not be satisfied unless the whole constitutional plan is reconsidered de novo and that no revised plan would be acceptable to Muslims unless it is framed with their approval and consent.

"Resolved that it is the considered view of this Session of the All India Muslim League that no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principles, viz., that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be constituted, with such territorial readjustments as may be necessary that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the North Western and Eastern Zones of (British) India should be grouped to constitute 'independent states' in which the constituent units should be autonomous and sovereign.

"That adequate, effective and mandatory safeguards should be specifically provided in the constitution for minorities in these units and in the regions for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interests in consultation with them and in other parts of India where the Muslims are in a minority adequate, effective and mandatory safeguards

shall be specifically provided in the constitution for them and other minorities for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interests in consultation with them.

"The Session further authorizes the Working Committee to frame a scheme of constitution in accordance with these basic principles, providing for the assumption finally by the respective regions of all powers such as defense, external affairs, communications, customs, and such other matters as may be necessary."[1]

২৩শে মার্চ ১৯৪০, লাহোর, নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে স্বায়ত্বশাসনের ভিত্তি সৃষ্টি হয়। এখানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা, জিন্নাহসহ মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ এ. কে. ফজলুল হক উত্থাপিত প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। জিন্নাহ'র সভাপতির ভাষণের পর প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ১৯৪১ সালের মাদ্রাজ সম্মেলনে ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাবটিকে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ তার মূল লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত করে।[2] ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাবের মূল ভাষ্য ছিল– 'সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে, নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বিবেচিত অভিমত– নিম্নের মূলনীতি ব্যতিরেকে কোনো সাংবিধানিক ব্যবস্থা এদেশে কার্যকর করা সম্ভব না, বা মুসলমানের পক্ষে গ্রহণযোগ্য না, যথা– ভৌগোলিকভাবে পার্শ্ববর্তী ইউনিটগুলোকে এক-একটি অঞ্চল হিসাবে প্রয়োজন অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় পূনর্বিন্যাসের মাধ্যমে এমনভাবে গঠন করতে হবে যাতে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা যেমন ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলগুলোকে সংঘবদ্ধ করে এক-একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা যায় এবং যেখানে শাসনতন্ত্র হবে স্বাধীন ও সার্বভৌম। এ সমস্ত ইউনিট ও অঞ্চলের সংখ্যালঘুদের পর্যাপ্ত কার্যকর এবং আইনানূগ নিরাপত্তার ব্যবস্থা সংবিধানে রাখতে হবে যাতে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য অধিকার ও তাদের পরামর্শ অনুযায়ী সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে যেখানে মুসলমানরা সংখ্যালঘু সেখানেও তাদের পরামর্শ সাপেক্ষে তাদের জন্য সংবিধানে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা রাখতে হবে।'

লাহোর প্রস্তাব দেয় ভারতীয় মুসলমানকে আবাসভূমি হিসাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রসমুহ গঠনের একটি আন্দোলনের সুযোগ। এ প্রস্তাবের ভারতীয় মুসলমানের আবাসভূমি হিসাবে দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের গঠন কথা বলে– একটি পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও কাশ্মীর নিয়ে গঠিত উত্তর-পশ্চিম ভারতে এবং অন্যটি বাংলা ও আসাম নিয়ে গঠিত উত্তর-পূর্ব ভারতে। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের মূলভিত্তিই ছিল আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার ও সার্বভৌমত্ব স্বীকৃতিদান। যে লাহোর প্রস্তাব পাকিস্তানের বুনিয়াদ স্বাধীনতার উপর সৃষ্টি করা হয়, পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিবর্গ তার প্রতিই প্রদর্শন করে উপেক্ষা। শুধু তাই নয়, স্বায়ত্তশাসনের দাবীদার মুক্তমনা মানুষকে তারা বিচ্ছিন্নতাদাবী এবং পাকিস্তানের দুষমন বলে অভিহিত করতেও দ্বিধা করে না। উদাহরণ স্বরূপে বলা যায়, ১৯৪১ সালের 'সমর পরিষদ'-কে কেন্দ্র করে জিন্নাহ-হক-এর গুরুতর মতানৈক্যের কথা। কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের চাপে শেষ পর্যন্ত এ. কে. ফজলুল হক 'সমর পরিষদ' ত্যাগ করতে বাধ্য হন। লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর থেকেই মুসলিম শাসকচক্র এ ধরণের ষড়যন্ত্রের কথা কিভাবে চিন্তা করতে পারে! এ প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক। জবাবও সহজ। পূর্ব-বঙ্গ সম্পদ আর ঐশর্যের দিক থেকে স্বাভাবিকভাবে বিশ্বের একটি

[1] The Lahore Resolution: March 23, 1940 – Lahore.
[2] On 15 April 1941 the Lahore Resolution was incorporated as a creed in the constitution of the All-India Muslim League in its Madras session.

পরিচত স্থান। অতএব, এ দেশের প্রতি সবারই লোলুপ দৃষ্টি থাকা অন্যায় না। এ সম্পদই বাংলার এবং বাঙালির ভাগ্যে বারবার দুর্ভোগ টেনে এনেছে। এ বিষয়ে কোনো বির্তকের অবকাশ নেই।

> "You are free; you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other place of worship in this State of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed — that has nothing to do with the business of the State... We are starting with this fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one State [...] I think we should keep that in front of us as our ideal and you will find that in due course Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims, not in the religious sense, because that is the personal faith of each individual, but in the political sense as citizens of the State."[3]

পাকিস্তান গণপরিষদে, ১১ই আগষ্ট ১৯৪৭, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যে-ভাষণ দেন তার সুরটি ছিল– 'আমি যে মন্তব্য প্রথম করতে চাই তা হচ্ছে, ... সরকারের প্রথম কর্তব্য আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা যদ্বারা নাগরিকদের জান, মাল, ধর্মবিশ্বাসের নিরাপত্তা বিধান রাষ্ট্রের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হতে পারে। ... দ্বিতীয় বিষয়টি যা আমার মনে উদয় হচ্ছে তা হলো, যে সব অতি বড় বড় অভিশাপের দরুন দেশ দুর্দশা ভোগ করছে তাদের মধ্যে অন্যতম হলো ঘুষ নেয়া ও দুর্নীতি। ... একে আমাদের অবশ্যই দমন করতে হবে লৌহ হস্তে। ... কালোবাজারী হচ্ছে আর একটি অভিশাপ। ... এই সময়ে এই দানবের বিরুদ্ধে আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। ... পরবর্তী যে বিষয়টি আমার মনে হচ্ছে সেটা হলো স্বজন পোষণ এবং দালালী। ... এই পাপকে ধ্বংস করতে হবে নির্মমভাবে। ... এখন আমরা কি করব? যদি আমরা মহান রাষ্ট্রকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করতে চাই, আমাদের সম্পূর্ণ এবং একান্ত ভাবে মনোনিবেশ করতে হবে জনসাধারণ বিশেষতঃ গরীবদের মঙ্গলসাধনের জন্য। ... ক্রমে ক্রমে সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘুদের মধ্যে সমস্ত জটিলতা অন্তর্হিত হবে। বস্তত যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তা হলে বলবো, এ হচ্ছে মুক্তি এবং স্বাধীনতা অর্জনের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায়, এগুলি না থাকলে আমরা বহু পূর্ব হতে থাকতে পারতাম একটি স্বাধীন জাতি। সকলের স্মরণ রাখতে হবে একটি শিক্ষা– আপনারা স্বাধীন, আপনাদের স্বাধীনতা রয়েছে আপনাদের মসজিদে মন্দিরে যাওয়ার অথবা আপনাদের সম্মুখে কোন বাধা নেই পাকিস্তান রাষ্ট্রে অন্য কোন ভজনালয়ে যাবার। আপনি যে কোন ধর্ম কিংবা বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন, তার কোন সম্পর্ক নেই রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সাথে। ... এবং আপনারা দেখতে পাবেন যে, এমন এক সময় আসবে, যেদিন হিন্দু আর হিন্দু থাকবে না, মুসলমান আর মুসলমান থাকবে না, ধর্মীয় অর্থে অবশ্য নয়, কারণ তা হলো প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিশ্বাস তা হবে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে রাজনৈতিক অর্থে।'

ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত পাকিস্তানকে একটি উন্নত বুর্জোয়াগণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করেন জিন্নাহ, কিন্তু এ-সুযোগকে বাস্তবে পরিণত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। জিন্নাহর চিন্তা ছিল অবাস্তব, নিছক আদর্শ মাত্র। ধৈর্যের সঙ্গে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা বা সদিচ্ছামূলক কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করার উৎসাহ ছিল না। পাকিস্তানকে শোষণমুক্ত করার ব্যাপারে তাঁর কোনো স্থিরচিন্তা ছিল না। জাতির পিতাসুলভ প্রাণশক্তিরও অভাব ছিল। তাঁর পরিচালন পদ্ধতি ছিল বটতলার মানুষের মতামত উপেক্ষা করে উপরতলার মানুষের আদেশ অনুসরণ করে চলা, এর সঙ্গে তার কর্মকাণ্ড পাকিস্তানের রাজনীতিকে নিয়ে যায় এক স্বৈরাচারী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে। তাই জিন্নাহ মৃত্যুর (১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৮) পর পরই পাকিস্তানে সৃষ্টি হয় অস্থির রাজনৈতিক অবস্থা; গণতান্ত্রিক

[3] Quaid-e-Azam, Mohd Ali Jinnah's speech on August 11, 1947.

রাজনীতির চর্চা থেকে বিচ্যুত হয়ে সামরিক অফিসারদের কল্পরাজ্যে পরিণত হয়। ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর সামরিক অফিসার সারাদেশে সামরিক আইন জারি করে। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্জা ২৪শে অক্টোবর এক ঘোষণায় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেন আইয়ুব খানকে; কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! ২৭শে অক্টোবর রাতের অন্ধকারে ইস্কান্দার মির্জাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়ে স্বনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হয় আইয়ুব খান। ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ইস্কান্দার মির্জা দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। শক্তিশালী রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অভাবে আইয়ুব খান নিজেকে প্রধান সেনাপতি ও প্রধান সামরিক প্রশাসক হিসাবে ঘোষণা করে। ক্ষমতাসীন হওয়ার পরই আইয়ুব তার ক্ষমতাদখলকে 'অক্টোবর বিপ্লব' হিসাবে আখ্যায়িত করে। ২৭ই অক্টোবর দিনটি, জনগণের সম্মতি ছাড়াই, 'অক্টোবর বিপ্লব' হিসাবে পালন করার সুব্যবস্থা করে। আইয়ুব খান চতুর রাজনীতিবিদ ছিল, তাই প্রথম সুযোগেই রাজনীতিক দলগুলোর প্রতি আক্রমণ শুরু করে। রাজনীতিক দলগুলোর কার্যকলাপ ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দুটি আদেশ জারি করে (৭ই আগস্ট ১৯৫৯)– ১. পোডো[৪], এবং, ২. এবডো[৫]। ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারিতে আইয়ুবের নিজস্ব চিন্তাধারায় পরিকল্পিত 'মৌলিক গণতন্ত্র'[৬] পদ্ধতির আওতায় 'প্রথম নির্বাচিত' প্রেসিডেন্ট হয়।

> The Basic Democracies system was set up as five-tiers institutions. Tier one was composed of union councils, one each for groups of villages having an approximate total population of 10,000. Each union council comprised ten directly elected members and five appointed members. Union councils were responsible for local agricultural and community development and for rural law and order maintenance; they were empowered to impose local taxes for local projects. Tier two: consisted of the *tehsil* (subdistrict) councils, which performed coordination functions. Tier three: the district (*zilla*) councils were composed of nominated official and non-official members, including the chairmen of union councils. The deputy commissioners chaired this body. The district councils were assigned both compulsory and optional functions pertaining to education, sanitation, local culture, and social welfare. Tier four: the divisional advisory councils coordinated the activities with representatives of government departments. Tier five: consisted of one development advisory council for each province and chaired by the governor who was appointed by the president.[7]

তিন বছরের মাথায় আইয়ুব-বিরোধী ছাত্র-আন্দোলনের সূচনা ঘটে; রাজনীতিক নেতাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, দেশের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও স্বজপ্রীতির কারণে। ১৯৬১ সালের শেষ দিকে পূর্ব-বঙ্গে সর্বপ্রথম আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ২৪শে জানুয়ারি ১৯৬২ সালে পূর্ব-বঙ্গ[৮] ছাত্রলীগ ও পূর্ব-বঙ্গ[৯] ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ এক গোপন বৈঠকে মিলিত হয়ে, গণতন্ত্রের পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে দল নির্বিশেষে, প্রণয়ন করে আইয়ুব-সামরিক-শাসন-বিরোধী আন্দোলনের কর্মসূচী। এর এক সপ্তাহ পরেই নিরাপত্তা আইনের আওতায়, বিদেশী অর্থানুকূল্যে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে অভিযুক্ত করে সোহরাওয়ার্দীকে করাচিতে আটক করা হয়। ১লা ফেব্রুয়ারি আইয়ুব যখন ঢাকায় আসে তখন ছাত্র-জনসাধারণ সোহরাওয়ার্দির গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে সামরিক-শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভপ্রতিবাদ করতে রাজপথে নেমে পড়ে। স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট পালিত হয়। সামরিক আইনের প্রতি ভ্রূকুটি করে প্রকাশ্যে রাজপথে মিছিল হয়। 'নিপাত যাক আইয়ুব খান' ও

[4] Public Officers Disqualification Order (PODO).
[5] Elective Bodies Disqualification Order (EBDO).
[6] Basic Democracies
[7] A. R. Choudhury.
[৮] পূর্ব-পাকিস্তান।
[৯] পূর্ব-পাকিস্তান।

‘নিপাত যাক সামরিক শাসন’– এরকম দেয়াল-লিখনিতে ঢাকা শহর ছেয়ে যায়। পরের দিন ছাত্রমহল সরকারী পত্রিকা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে; গণ-আন্দোলন সম্বন্ধে কোনো খবর প্রকাশ না করায়। ৭ই ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতা আইয়ুবকে ঘেরাও করার কর্মসূচী গ্রহণ করে। আইয়ুব তখন জন-নিরাপত্তা আইনের বলে গণ-আন্দোলনকে দমন করার চেষ্টা করে; নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করে। মার্চে আইয়ুব খান তার পরিকল্পিত শাসনতন্ত্র ঘোষণা করে, এর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল– জনগণের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের কোনো অধিকার নেই, মেললিক গণতন্ত্রীরা প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবে। আর করাচি থেকে পাকিস্তানের রাজধানী স্থানান্তর করে ইসলামাবাদে স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

বাংলার পাটে উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে পশ্চিমা গড়ছে প্রাসাদোপম অট্টালিকা। আর বাংলার জনগণের নেই মাথা গুঁজার কোনো ঠাঁই। বাংলার জনগণের রক্তে পরিশোধ্য বৈদেশিক ঋণে পশ্চিমাঞ্চলের বিরাট এলাকার লবণাক্ততা দুর হয়, মঙ্গলা তারবেলা এবং গোলাম মোহাম্মদ বাঁধ তৈরি হয়; কিন্তু বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলার জনগণ যখনই দাবী তুলছে তখনই কেন্দ্রীয় সরকারের কোষাগারে অর্থের টান পড়ে। বাংলার কৃষক ও জনগণের নিকট থেকে আদায়কৃত অর্থে প্রতিপালিত হচ্ছে বিরাট সেনাবাহিনী। দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি সদর দপ্তরই পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত– যদিও পাকিস্তানের মানুষের শতকরা ছাপান্নজনের বাসভূমি পূর্ব-বঙ্গ; তবুও এখানে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না দেশরক্ষা বাহিনীর কোনো একটি সদর দপ্তর। শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী এবং দ্রব্য মূল্যের তারতম্যে কল্পনাতীতভাবে বৈষম্য বিরাজ করছে দু’অংশের মধ্যে।

স্বাভাবিক কারণেই পূর্ব-বঙ্গের মানুষ আইয়ুবের অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত মেনে নিতে চায়নি; তাই শুরু হয় আন্দোলন; এর দাবীগুলো ছিল– নতুন শাসনতন্ত্র বাতিল, দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, আর সকল রাজবন্দিকে মুক্তি দেওয়া। সেপ্টেম্বরে ছাত্ররা আইয়ুবের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। শিক্ষাসঙ্কোচন নীতি পরিহার, তিন বছরের স্নাতক কোর্স বাতিল ও সোহরাওয়ার্দির মুক্তির দাবিতে আন্দোলন সারা পূর্ব-বঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। এ আন্দোলন চলে সোহরাওয়ার্দি মুক্তি পাওয়া পর্যন্ত (১০ই সেপ্টেম্বর)। ধীরে ধীরে যখন আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে তখন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী, ১৯৬৪ সালে, অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে পূর্ব-বঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীজ বুনতে শুরু করে। প্রথমে হিন্দু-মুসলিম পরে বিহারী-বাঙালি দাঙ্গারূপে আত্মপ্রকাশ করে। ছাত্র, বুদ্ধিজীবি ও রাজনীতিকরা এ ভয়াবহ দাঙ্গাকে থামাতে গিয়ে একটি ‘দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি’ গড়ে তুলেন। এ কমিটির উদ্যোগে ‘পূর্ব-পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও’ শিরোনামে একটি প্রচারপত্র ছাপা হয়; কিন্তু পূর্ব-বঙ্গের গভর্ণর মোনায়েম খান এ প্রচারপত্রের জন্য নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহী মামলা দায়ের করেন। অন্যদিকে স্বৈরাচারীশাসক আইয়ুব খানের দোসর মোনায়েম খানের, আচার্য হিসাবে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে বাধে ছাত্র-পুলিশের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ; যা পরে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। সরকার গায়ের জোরে পূর্ব-বঙ্গের ৭৪টি কলেজ ও ১৪০০টি হাইস্কুল বন্ধ আর ১২০০জন ছাত্রকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করে দেয়। পাকিস্তান সরকার ‘আজাদ’, ‘সংবাদ’ ও ‘ইত্তেফাক’ পত্রিকাগুলোকে মাথাপিছু ৩০ হাজার টাকা করে জরিমানা করে; কারণ, তারা আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনের খরব ছাপিয়ে ছিল।

The second Indo-Pakistani conflict (1965) was also fought over Kashmir and started without a formal declaration of war. The war began in August 5, 1965 and was ended Sept 22, 1965. The war was initiated by Pakistan who since the defeat of India by China in 1962 had come to believe that Indian military would be unable or unwilling to defend against a quick military campaign in Kashmir, and because the Pakistani government was becoming increasingly alarmed by

> Indian efforts to integrate Kashmir within India. There was also a perception that there was widespread popular support within for Pakistani rule and that the Kashmiri people were disatisfied with Indian rule.[10]

বৈষম্য এবং রাজনৈতিক পীড়নে যখন বাংলার আকাশ-বাতাস তপ্ত, তখন (৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ সাল) ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ শুরু হয়। কাশ্মির সমস্যা নিয়ে পুনরায় শুরু হয়। শত্রুতামূলক অভিযান ও পাল্টা অভিযান। ১৭দিন যুদ্ধের পর পাকিস্তান, সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যস্থতায়, তাশখন্দ চুক্তি স্বাক্ষর করে। ভারতের সঙ্গে আপস মীমাংসায় পৌঁছে; কিন্তু ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ফলাফলে পাকিস্তানের জনগণ ও রাজনীতিকদের মধ্যে খুবই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। আর এ যুদ্ধই পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যে বিপদকালে কি অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে তার নগ্নরূপ প্রকাশ করে বাঙালির সামনে।

পাকিস্তান সরকার, ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর, প্রকাশ্যেই রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ২০ই জুন ১৯৬৭ সালে সরকারী দলের নেতা সবুর খান রাওয়ালপিণ্ডিতে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে পয়লা বৈশাখ পালন ও রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্‌যাপন করা ইসলামবিরোধী কাজ বলে আখ্যায়িত করে। ২২শে জুন তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবউদ্দিন আনুষ্ঠানিকভাবে রেডিও-টেলিভিশনে রবীন্দ্রচর্চা নিষিদ্ধ করে। এর প্রতিবাদে ডাকসু ও সংস্কৃতি সংসদ প্রতিবাদসভা ও মিছিল করে। প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত এক সভায় রবীন্দ্রনাথ ও পয়লা বৈশাখকে বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে ঘোষণা করা হয়। খুলনা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট ও দেশের অন্যান্য জায়গাতে সংস্কৃতি সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এরকম প্রতিবাদের মুখে ১৯৬৭ সালের ৪ঠা জুলাই তথ্যমন্ত্রী তার বক্তব্য প্রত্যাহার করে।

পূর্ব-বঙ্গবাসী অবাক বিস্ময়ে দেখে পশ্চিমা শোষকগোষ্ঠী দেশকে কোথায় নিয়ে চলেছে। কি করুণ এবং বিভীষিকাময় সে-রূপ; এ কল্পনা করা যায় কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। অন্যদিকে এ অবস্থার বিরুদ্ধে কিছু বলাও যাবে না; মাথার উপর ঝুলানো হয়েছে দেশরক্ষা আইনের খড়্গ। কোনো কথা বললেই বিনাবিচারে আটক এবং অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারাবাসের সুব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। সমস্ত দেশ এ নির্যাতনমূলক আইনের আওতায় স্তব্ধ থাকলেও একটি কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে পারেনি। সে কণ্ঠ, শত বাঙালির এক কণ্ঠ, মুজিব কণ্ঠ। ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ সালে অনুষ্ঠিত লাহোর সম্মেলনে পূর্ব-বঙ্গ[১১] আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান ছয়দফা দাবী পেশ করেন–

১. দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হবে ফেডারেল শাসনভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হবে সার্বভৌম;
২. ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা, এ ক-টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে। অপরাপর সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা হবে নিরঙ্কুশ;
৩. দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকতে হবে যাতে পূর্ব-বঙ্গের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে। এ বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে, দুই অঞ্চলে দুটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করতে হবে;
৪. সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, করধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের কোনো করধার্য করার ক্ষমতা থাকবে না।

[10] A. R. Choudhury.
[১১] পূর্ব-পাকিস্তান।

আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভেনিউর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে জমা হবে। এ মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসসূহের উপর পরীক্ষামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকবে;

৫. ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করতে হবে এবং বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত হার অনুযায়ী প্রদান করতে হবে। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে অঙ্গরাষ্ট্রগুলির এখতিয়ারাধীন থাকবে। ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির মধ্যে আমদানী-রফতানী করার অধিকার অঙ্গরাষ্ট্রগুলির হাতে ন্যস্ত করে শাসনতন্ত্রে বিধান করতে হবে;

৬. পূর্ব-বঙ্গকে মিলিশিয়া বা প্যারা-মিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হবে। পূর্ব-বঙ্গে অস্ত্র কারখানা নির্মাণ ও নৌবাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপন করতে হবে।

স্বাধীনতা উত্তরকালে অঞ্চলে অঞ্চলে ও মানুষে মানুষে সৃষ্ট বৈষম্যের পাহাড় ভেঙে পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতিকে মজবুত বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠাকল্পে স্বায়ত্তশাসনের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যাসহ পেশ করা হয় ছয়দফা কর্মসূচী। ছয়দফা আইয়ুবি স্বৈরতন্ত্র বন্ধ করে অর্থনৈতিক উন্নতির কথা বলে; এতে নিম্ন ও উচ্চ মধ্যবিত্তের মনে নতুন এক আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলে। বাংলার জনগণ একবাক্যে ছয়দফাকে বাংলার শোষণমুক্তির এবং মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করার সনদ বলে গ্রহণ করে; কিন্তু পশ্চিমা শাসকচক্র তা মেনে নিতে অস্বীকার করে; বরং তারা শেখ মুজিবর রহমানকে অভিযুক্ত করা হয় পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগে। দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিক দলগুলোও তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করে; আওয়ামী লীগের নীতিকে জাতীয় সংহতির পরিপন্থী বলে প্রচার করে। সত্য ও নায্যা দাবীর কারণে মুজিবর রহমান ও আওয়ামী লীগের উপর নেমে আসে জুলুম-অত্যাচার-জেল-নির্যাতন। মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে সাজানো হতে থাকে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'। ১৩ই মে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে 'প্রতিবাদ দিবস' পালিত হয়।

৭ই জুন ১৯৬৬ সালে ছয়দফার সমর্থনে আওয়ামী লীগ পূর্ব-বঙ্গে হরতাল ডাকে; সর্বত্র কলখারখানা বন্ধ ও নাগরিক জীবন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে পড়ে। হরতাল চলাকালীন একজন শ্রমিক পুলিশের গুলিতে নিহত হয়; এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব-বঙ্গ জুড়ে তীব্র বিক্ষোভ ও প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয়। ছয়দফা দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। পূর্ব-বঙ্গের ছাত্র ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ছয়দফা বিশেষ সাড়া জাগায়। জনগণের স্বৎস্ফূর্ত হরতালে আইয়ুব খান অন্য কোনো পথ না পেয়ে অস্ত্রের ভাষাপ্রয়োগে এবং গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে ছয়দফার মোকাবেলা করার হুঙ্কার দেয়। উচ্চারণ করে, 'অশুভ প্রচেষ্টা মোকাবেলার জন্য সরকার সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে।' চালায় নির্বিচারে অত্যাচারের স্টিমরোলার, পুলিশ ও ই.পি.আর বাহিনী বেপরোয়া ভাবে গুলি চালায় জনতার উপর, এতে অনেক বাঙালি প্রাণ হারায়। দেশের নেতাসহ শীর্ষস্থানীয় সব রাজনৈতিক নেতাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করে। দেশরক্ষা আইন প্রয়োগ করে বন্ধ করে দেয় আওয়ামী লীগ ও স্বায়ত্তশাসনের সমর্থক দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকাকে। বাজেয়াফত করা হয় ইত্তেফাক পত্রিকার সম্পত্তি।

এ-এক অবিশ্বাস্য এবং নাটকীয় ঘটনা; কিন্তু এত করেও ছয়দফার সঞ্জীবনী আবেদনকে ম্লান করা বা দমানো সম্ভব হয়নি। অতএব আইয়ুব ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৬৭ সালে খুলনার এক জনসভায় আওয়ামী লীগ ও ন্যাপকে প্রকাশ্যে দেশদ্রোহী বলে ঘোষণা করে। শুরু হয় 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা', বঙ্গবন্ধু এক নম্বর আসামী, সঙ্গে আরও ৩৪জন অভিযুক্ত। ১১জনকে ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়, রাজসাক্ষী হওয়ার কারণে। ছয়দফাকে নস্যাৎ করাই ছিল এ মামলার মুখ্য উদ্দেশ্য। ১৯শে জুন ১৯৬৮ থেকে চাঞ্চল্যকর এ সাজানো তথাকথিত রাষ্ট্রদ্রোহী 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র বিচার কাজ শুরু হয়।

কুর্মিটোলা সেনানিবাসে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থার ভেতর এ প্রহসনমূলক মামলার শুনানিতে দেশীবিদেশী সাংবাদিকরা উপস্থিত হন। পশ্চিম পাকিস্তানিরা ভাবে বাংলার বুকে আর কেউ শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে স্বায়ত্তশাসনের দাবী তোলার থাকবে না; বাস্তবে ফল হয় উল্টো। আইয়ুব ও মোনায়েম খানের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে বাংলার অধিকার সচেতনজাগ্রত বীরজনতা। বাঙালি জনতার হুঙ্কারে বাংলার আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠে, 'আইয়ুব গদিতে আগুন ধরাও'। থরথর করে কেঁপে উঠে আইয়ুব-মোনায়েমের তখতে তাউস। আইয়ুব চমকে উঠে, নিমজ্জমান তরী রক্ষার ব্যাপৃতিতে নিয়োজিত হয়। বাঙালির উপর নেমে আসে আইয়ুবের আবারও স্টিমরোলার এবং অমানুষিক নির্যাতন। সৃষ্টি হয় উনসত্তরের গণ-আন্দোলন। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য ও মুজিবর রহমানের ছয়দফা দাবীর সমর্থনে সর্বদলীয় 'ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ' নিজস্ব দাবী দেয় 'এগার-দফা'।

১. আত্মনির্ভরশীল কলেজগুলোকে প্রাদেশিক-করণ নীতি প্রত্যাহার করে জগন্নাথ কলেজকে সাবেক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। শিক্ষার ব্যাপক প্রসার, কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব, মাতৃ"ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, কলেজে নৈশিভিভাগ খোলা, শিক্ষকদের বাক-স্বাধীনতা প্রদান, মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যারয় প্রতিষ্ঠা, ছাত্রদের বেতন হ্রাস, ছাত্রবাসে উন্নমানের খাওয়ার ব্যবস্থা, চাকরিতে নিশ্চয়তা দান, বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদি।
২. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রর্বতন।
৩. পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন।
৪. পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষুদ্র প্রদেশগুলোর জন্য স্বায়ত্তশাসন ও একটি সাবফেডারেশন গঠন।
৫. ব্যাংক, ইন্সুরেন্স, পাটের ব্যবসা ও অন্যান্য বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ।
৬. কৃষকদের খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস।
৭. শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, বোনাস, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান এবং ধর্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার।
৮. পূর্ব-বঙ্গে[১২] বন্যায়-নিয়ন্ত্রণ এবং জনসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার।
৯. জরুরি অবস্থা, নিরাপত্তা আইন এবং অন্যান্য নির্যাতনমূলক আইন প্রত্যাহার।
১০. সামরিক চুক্তি বাতিল এবং নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি গ্রহণ।
১১. যাবতীয় রজ্বন্দিদের মুক্তি ও রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার।

'এগার-দফা' দাবীতে ১৮ই জানুয়ারি ১৯৬৯ থেকে ছাত্রসমাজ আন্দোলন শুরু করে। অন্যদিকে বাঙালির উপর পূর্ণমাত্রায় চলতে থাকে আইয়ুবি নির্যাতন। শুরু হয় ১৪৪ধারা জারি, বিক্ষোভ মিছিল, পুলিশের গুলি, বাঙালির উপর নির্যাতন, গ্রেফতার আর হত্যা। মওলানা ভাসানীও ১৪৪ধারা ভাঙতে নামাজ পড়তে নেমে পরেন ঢাকার মহাসড়কে। আইয়ুব এ আন্দোলনের কারণে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯, বঙ্গবন্ধু কুর্মিটোলার সামরিক ছাউনী থেকে বেরিয়ে ২৩শে ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে লাখ মানুষের সমাবেশে ঘোষণা করেন, 'শহীদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। আমাদের দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবেই।'

স্বঘোষিত 'ফিল্ড মার্শাল' আইয়ুব বাংলার গণ-বিক্ষোভকে দমন করতে না পেরে বা গুলি চালিয়ে বাংলার জনতার এ-দুর্বার আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে অক্ষম হয়ে, ২৫শে মার্চ ১৯৬৯ গদি ত্যাগ করে।

[১২] পূর্ব-পাকিস্তানে।

ক্ষমতা প্রদান করা হয় একই পোশাক পরা সামরিক কর্তা ইয়াহিয়ার কাছে। পাকিস্তানে আবারও সামরিক আইন জারি হয়; এটা নতুন বোতলে পুরাতন মদ রাখার প্রয়াস যেন। উদ্দেশ্য ইয়াহিয়াকে দিয়ে কোনোরকমে পূর্ব-বঙ্গের উপর শাসনশোষণ অব্যাহত রাখা; বা অব্যাহত রাখা যায় কি না তা যাচাই করে দেখা। জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটে নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দেয় ইয়াহিয়া; কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিলেই যে, সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে এমন কথা তো পশ্চিম-পাকিস্তানির অভিধানে নেই। নির্বাচনের দিন ঘোষিত হয় ৫ই অক্টোবর '৭০; কিন্তু ১২ই নভেম্বরের ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কারণে একে পিছিয়ে ৭ই ডিসেম্বর ধার্য করা হয়। বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ ছয়দফা কর্মসূচীকে নির্বাচনী মেনিফেস্টারূপে জনগণের কাছে তুলে ধরেন। বঙ্গবন্ধ বলেন, 'যদি আপনারা বাংলার শোষণ মুক্তি চান, যদি পাকিস্তানের নাগরিকত্বের সমান মর্যাদা চান, ছয়দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন চান; তবে আমার দলের মনোনীত প্রার্থীদের ভোট দিন।'

বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ বিশ্বের সকল নির্বাচনী রেকর্ডকে ম্লান করে একবাক্যে বঙ্গবন্ধুকে মনোনীত করে। ইসলামাবাদের এবং লারকানার শীততাপনিয়ন্ত্রিত বিলাসবহুল বাড়িতে বসে সোমরসে আমোদিত ইয়াহিয়া-ভুট্টো আঁতকে উঠে। রাজনৈতিক নেশা বুদবুদের মত বিলিন হয়। শুরু হয় ষড়যন্ত্রের খেলা। ঠিক করা হয় আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসতে দেওয়া যাবে না। আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা যাওয়া মানেই বাঙালির প্রভুত্ব স্বীকার করে নেওয়া। সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে আর শোষণ করা সম্ভবপর হবে না। শুরু করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিপরীতে সামরিক বাহিনীর নিরস্ত্র মানুষের হত্যাযজ্ঞ। দেশ-রক্ষার অজুহাতে দেশ-ভাঙার খেলা শুরু করে পাকিস্তান সমর বাহিনী। ষড়যন্ত্রের পরিণতি হিসাবে ২৫শে মার্চ '৭১-এর রাতের অন্ধকারে যা শুরু হয় তার ব্যাপকতা, নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতা সমস্ত বিশ্ববাসীর অজানা না। সচেতন বাঙালি হয়ে ওঠে অস্থির ও বিক্ষুব্ধ। রাষ্ট্রের ভিত কেঁপে ওঠে। সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে জাতীয়-অস্তিত্ব ধরে রাখার তাগিতে স্বাধীনতার ঘোষণা করেছে, ধরেছে অস্ত্র।

জয় বাংলাদেশ। মুক্ত বাংলাদেশ।

মূল খসড়া: ১৯৭১।
লন্ডন।